ধারাবাহিক

যখন বৃষ্টি নামল

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ ঐহিক জানে পিসি যা-ই রান্না করে নিয়ে আসুক, বাবা যা খেতে ভালোবাসত মা তার কোনওটাই খাবে না। পিসির মেয়ে রিনি একটা খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু এটা পিসিকে কি বলা যায়? বাবার একটা বড়দা ছিল আজ জানতে পারল ঐহিক। বাড়িতে ঢোকার মুখে ভূমানন্দের চোখে পড়ল একটা সাপ। কেকা বলল সাপটাকে দেখতে খুব খুব সুন্দর। রনি ফিরছে। সুচারুর আবার নাটক করা নিয়ে কুহু অস্থির। পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

১৭

পাঁচালি ভাঁজ করে তুলে রাখতে রাখতে ভাবছিল ও, পাঁচালি পড়ার সময়ও মন দিতে পারেনি একদম। কেবলই রনির চিন্তা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল লক্ষ্মীকে বলে কয়েকটা ডাব আনিয়ে রাখতে হবে। মেয়েটা ক'দিন ঘোর অনিয়ম করেছে। ডাব খেলে যদি শরীর ঠান্ডা হয়।

পুজো সেরেও বেশ খানিকটা ফাঁকা সময়। মেয়ের আলমারিতে অনেকদিনই হাত পড়ে না। পোকাটোকা হল কিনা কে জানে? আলমারির তাক থেকে কাগজগুলো তুলে ঝাড়ছিল কুহু। সেই কবে পাতা হয়েছে, তারপর থেকে একটুও হাত পড়েনি।

ঝাড়াঝুড়ি করার সময় চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নজরে এল রনির সাদা কালো একটা ছবি। মাথায় চওড়া ব্যান্ড। চুলগুলো ছোটছোট করে ছাঁটা। কপাল ঢেকে দিয়েছে। ছোটবেলার ছবি। ওইসময় রনিকে পার্লারে নিয়ে যাওয়া হত না। ওর চুল নিজেই কেটে দিত কুহু। ছবিটা একটা কাগজে মোড়া ছিল। কাগজটা দিয়ে ফের মুড়িয়ে রাখতে গিয়ে কার যেন খুদি খুদি হাতের লেখা নজরে এল। চিঠি একটা। নীচে ঐহিকের নাম। দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য। রনি তোর ছবিটা ফেরত পাঠালাম। ভালো থাকিস। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবছিল কুহু, ওদের সম্পর্কটা কি শেষই হয়ে গিয়েছে? মনে হয়। না হলে ছবিটা ফেরত দেবে কেন?

একইসঙ্গে আর একটা কথাও মাথায় ঘুরছিল ওর। ওরা যা করছে করুক না। কুহু কেন মাথা ঘামায়? সুচারু, রনিতা, ওদের ছাড়া কুহুর আর কোনও জগৎ এখনও তৈরি হল না কেন? ভাবছিল মেয়ে ফিরে এলে এবার নিজেকে একদম পাল্টে ফেলবে। সিঁড়ি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নীচে নামতে নামতে গেট খোলার আওয়াজ পেল। হয় সুচারু, নয় অন্য কেউ। একবার ভাবল উঁকি মেরে দেখে। পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করল ও। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মী যে সেই মুহূর্তে হাঁ করে ওকেই দেখছে সেটা সহজেই নজর এড়িয়ে গেল কুহুর।

কুয়াশা

কেকা শুয়েছিল চুপচাপ। শরীরটা ক'দিন ধরেই খুব ক্লান্ত লাগছে। সকালে বাথরুমে গলা দিয়ে টক জল উঠল খানিকটা। সেই থেকে গলা জ্বলছিল, শিশিতে রাখা জোয়ান খেয়ে কমল। এই জোয়ানটাও শাশুড়ি মা ভেজে একটা মাঝারি শিশিতে ভরে দিয়েছেন ওকে। সব ব্যাপারে এত গোছানো মানুষ আগে দেখেনি কেকা। ওর ব্যাপারে সবসময় নজর রাখেন। সকালেই বলছিলেন বউমা, তোমার মুখটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

কেকা বেমালুম মিথ্যে বলেছে। না মা শরীর তো ঠিকই আছে।

কথাটা উনি খুব বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হল না।

আসলে শরীর খারাপের কথা বললে এত অস্থির হন, ডাক্তার ওষুধ করে ব্যতিব্যস্ত করেন। তাই ঘটনাটা বেমালুম চেপে গিয়েছে ও। কিন্তু নিজের মনে কেকা খুব স্বস্তি পাচ্ছে না। এ রকম দুর্বলতা আগে তো কখনওই অনুভব করেনি। দিদির সঙ্গে একবার কথা বললে হত। কিন্তু রনির ফিরে আসার কথা আজ-কালের মধ্যে। তাই দিদিকে আর ডাকাডাকি করেনি।

এই ব্যাপারটা অন্য কিছুর পূর্বাভাস কিনা, মনে মনে সেই চিন্তা করছিল কেকা। ও সব সময়ে যথেষ্ট সাবধান থাকলেও কখন কি হয়ে যায়। ঘরের দেওয়ালের টিকটিকিটা টিকটিক আওয়াজ করতেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল । নাঃ এক্ষুনি কোনও নতুন আগন্তুককে চায় না কেকা। ভূমানন্দের সঙ্গে সম্পর্কটা এখনও যেন ঠিক জোড় লাগেনি। মাঝে মাঝে এই বাড়িতে নিজেকে কেমন অতিথি মনে হয়। এই সময়ে কোনও বাচ্চা এসে গেলে আর সামলানো যাবে না। কিন্তু কেউ যদি এসে গিয়েই থাকে তা হলে কী করবে ও? ভূমানন্দের মা তো হাঁ করেই আছেন। শুনলেই লাফাতে শুরু করবেন। ওঁকে কিছু বলা চলবে না। তবে পুরোনো দিনের মানুষ সত্যি সত্যি কিছু ঘটলে নিজেই যা বোঝার বুঝে যাবেন। একমাত্র দিদির সঙ্গেই পরামর্শ করা যায়। সেও পরে হবে। এখন এ নিয়ে ভেবে লাভ কি? তবে এতকিছু ভেবেও চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

গত রাতে সুচারুদা ফোন করেছিলেন। ভূমানন্দ আর ওকে থিয়েটারের রিহার্সাল দেখার নেমন্তন্ন করলেন। ভূমানন্দ অফিস নিয়ে যা ব্যস্ত, যাবে বলে মনে হয় না। কেকার নিজের খুব যেতে ইচ্ছে করছিল। নাটক দেখতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। হোক না রিহার্স্যাল, তবু নাটকেরই তো। ভূমানন্দ মাঝে মাঝে জোর করে হলে নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখায়। যদিও ওর একদম না-পছন্দ ব্যাপারটা, তবু যেতে হয়। সিনেমার সঙ্গে থিয়েটারের অনেক তফাৎ। ছায়ামানুষ আর আসল মানুষের পার্থক্যের মতো।

ছোটবেলায় দিদি গান শিখত, ও নাচ। ঘর অন্ধকার করে রেডিও চালিয়ে নাচা ওর অভ্যাস ছিল। শ্বশুরবাড়িতে এসে জায়গাটা পাল্টেছে। সন্ধে হয়ে গেলে কতদিন যে নিজের মনে ছাদে নেচেছে। এ বাড়ির ছাদটা অন্য সব বাড়ির থেকে একটু বেশি উঁচু। কারও চোখে পড়ার ভয় নেই। তবে ভূমানন্দের চোখে পড়েছিল একদিন।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। ছাদে নিজের মনে বেশ কিছুক্ষণ নাচার পর মনে হল কেউ যেন লক্ষ করছে ওকে। তাকিয়ে দেখে, আলসেতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একমনে নাচ দেখছে ভূমানন্দ। লজ্জা পেয়ে থেমে যেতেই কোনও কথা না বলে নীচে নেমে গিয়েছিল ও। কেকা বহুক্ষণ ছাদে বসেছিল একা। গোটা ব্যাপারটাই ওর মেজাজ খিঁচড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নীচে নেমে এসে দেখেছিল ভূমানন্দ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে সিগারেট। বাগানের দিকে তাকিয়ে। ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি তো বেশ নাচো! নাচতে জানো এটা আমাকে বলোনি তো?

এটা বলার মতো কোনও ব্যাপার নাকি?

বাঃ বলার মতো নয়। কী সুন্দর নাচছিলে, তোমাকে ঠিক পরির মতো দেখাচ্ছিল।

তুমি পরিদের নাচ দেখেছ বুঝি?

সিনেমায় দেখিনি?

আর কথা বাড়ায়নি কেকা। কথা বললেই কথা বাড়বে। যদিও ভূমানন্দের এইসব আবোলতাবোল শুনতে খারাপ লাগে না।

অতবড় চেহারা, ওইরকম একটা পজিসানে চাকরি, অথচ কথা বলে ঠিক ছোটদের মতো। বিয়ের আগে মন দিয়ে ওড়িশি শিখেছিল কেকা। তাই বিয়ের পর কোনারকে বেড়াতে গিয়ে সূর্যমন্দিরের দেবদাসীদের নাচের পোজগুলো দেখছিল মন দিয়ে।

ভূমানন্দ তখনও জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এত মন দিয়ে কী দেখছ? উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছে ও।

ছোটবেলা থেকেই নিজের কথা খুব একটা বলার অভ্যেস নেই কেকার। দিদি না বলতেই বুঝত সব। আর কারও বোঝার খুব একটা পরোয়া ছিল না। এখন হয়েছে মুশকিল। ভূমানন্দ সব জানতে চায়, বুঝতে চায়। আড়াল বা দূরত্ব রাখতে গিয়ে প্রায়ই ধরা পড়ে যায় কেকা। এই কৌতূহলটা যে ও পছন্দ করছে না সেটাই বা বোঝায় কী করে। বললে ভূমানন্দের মনে লাগতে পারে। আবার এই বিষয়টা কারোর সঙ্গেই আলোচনার নয়। দিদিকে বললেও বুঝবে কি? তা ছাড়া এ রকম উদ্ভুটে সমস্যার সমাধান দিদিকে করতেই বা বলে কী করে? হয়তো ওদের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ করবে।

কয়েকদিন আগেই ভূমানন্দ বলছিল অফিসের একটা গেট টুগেদার আছে। যাবে নাকি?

মনে হচ্ছিল কেকার, সোজাসুজি না-ই বলে দেয়। বলেনি। এ ভাবে বললে যদি কিছু টের পায়। উল্টে একটু হেসে কথা ঘুরিয়েছিল। কোথায়?

ডায়মন্ড হারবার। অফিসের একটা পার্টি অর্গানাইজ করছে। তবে